হারানো দিন হারানো মানুষ

১) প্রশ্ন : লেখক সুজিৎ চৌধুরী 'হারানো দিন হারানো মানুষ' গ্রন্থের 'বিনোদন (১)' অংশে তাঁর শৈশব জীবনের বিনোদনের বিষয়ে জানিয়েছেন। লেখককে অনুসরণ করে তাঁর শৈশব জীবনের বিনোদনের পরিচয় দাও।

উত্তর : সুজিৎ চৌধুরী 'হারানো দিন হারানো মানুষ' গ্রন্থের 'বিনোদন (১)' অংশে তাঁর শৈশব জীবনের বিনোদনের বিষয়ে জানিয়েছেন। সেই সময় তাঁদের বিনোদনের উপকরণ ছিল বেশির ভাগই ছিল 'অযান্ত্রিক'--- অর্থাৎ যন্ত্র নির্ভর নয়। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "আজকের দিনে শিশু এবং বালকদের সামনে বিনোদনের অজস্র উপাদান চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই প্রাগ্রসর যন্ত্রযুগ সেগুলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে।..... আমাদের বিনোদনের প্রায় সমস্ত উপকরণই ছিল অযান্ত্রিক।" তাঁদের বিনোদনের একটি পদ্ধতি ছিল গ্রামাফোন রেকর্ডে গান শোনা। কখনো কখনো তাঁদের জন্য সে ব্যবস্থা করা হত। একজন লোক আসতেন তাঁদের গান শোনানোর জন্য। চারটে গান শোনালে তাঁকে দিতে হত দু'পুরা (এক ধরনের ধুচুনি) ধান। একবার তাঁদের মাসির বাড়িতে **গ্রামাফোন রেকর্ডে গান শোনানোর** আসর বসে। সেবার শিল্পী ছিলেন একজন মহিলা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গ্রামাফোন রেকর্ডের মালিক। জাতিতে তিনি ছিলেন মুসলমান। তিনি লুঙ্গি পরে তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। গানের আসর আরম্ভ হওয়ার আগে তিনি একটা ভাষণের মধ্য দিয়ে সবাইকে গান শোনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। শিল্পী মহিলা গেয়েছিলেন, "মাগো আমার কালে জামাই ভালো লাগে না।"--- গায়ের বর্ণ কালো ছিল বলে এ গান সোনার পর ছোট সুজিৎ চৌধুরীর মন খারাপ হয়ে যায়।

যাত্রাগানের বিষয়ে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "আমাদের শৈশবে গ্রামের মানুষের যৌথ বিনোদনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল যাত্রাগান।" সেকালে পুজো বা বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাত্রা গানের আসর বসতো জমিদার বাড়িতে। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে গ্রামবাসীরা যাত্রাপালা উপভোগ করার সুযোগ পেত। প্রায় পনেরো ষোলো খানা গ্রামের মানুষ অনেক দূর দূর থেকে যাত্রাপালা দেখতে আসত। যাত্রাপালা নিয়ে তাদের উৎসাহ এত বেশি ছিল যে,

কোন কোন গ্রামের মানুষ ষোলো মাইল দূর থেকে পুরো একদিনের পথ অতিক্রম করে যাত্রাপালা উপভোগ করতে আসত। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক *আরণ্যক* উপন্যাসের গাঙ্গোতাদের কয়েক ক্রোশ হেঁটে ভাত খেতে আসার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আরণ্যক উপন্যাসে কয়েক ক্রোশ পায়ে হেঁটে গরিব গাঙ্গোতারা এসেছিল শুধুমাত্র ভাত খাওয়ার লোভে। বিভূতিভূষণ এদের প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে বিস্মিত হয়েছিলেন। আমিও ভাবি আনন্দ আস্বাদনের কতখানি তাগিদ থাকলে ষোলো মাইল দূর থেকে পুরো একদিনের পথ পাড়ি দিয়ে যাত্রাপালা দেখতে আসা যায়।" অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এসে যাত্রাপালার আসরে প্রবেশ করে তাদের আনন্দটা যেন অনেক অনেক বেশি বেড়ে যেত। ঐতিহ্যবাহী বিনোদনের আনন্দ উপভোগের আমেজটাই আলাদা, তাই শুধু গ্রামবাসীরাই নয় শহরবাসীরাও সেই আনন্দ উপভোগ করার জন্য লালায়িত থাকেন। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "আমাদের গ্রামীণ মানুষ, শুধু গ্রামীণ মানুষই বা কেন, শহরবাসী সাধারণ মানুষও ঐতিহ্যবাহী বিনোদনের মাধ্যমগুলিতে যে আনন্দ খুঁজে পান, অন্যত্র বোধ হয় তা পান না-- একথা যে এখনো সমান সত্য, চোখ কান খোলা রাখলে তা বোঝা যায়।"

অনেক 'নামী-দামী' যাত্রার দল আসত যাত্রা করতে। 'নট্ট-কোম্পানি' এবং 'ঢাকেশ্বরী অপেরা'র যাত্রার দল আসত। সারা রাত ধরে চলত যাত্রাপালা। লেখক তখন ছোট ছিলেন, তাই তিনি পুরো রাত জেগে যাত্রাপালা দেখতে পারতেন না। যাত্রার আসরে মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে পড়তেন। তবে তাঁর প্রিয় ছিল যুদ্ধের দৃশ্য। মাকে পূর্ব থেকে বলে রাখতেন, যুদ্ধের দৃশ্য আরম্ভ হলে তাঁকে যেন জাগিয়ে দেওয়া হয় । যে কোন ধরনের যুদ্ধের দৃশ্য তিনি খুব উৎসাহ সহকারে দেখতেন। যাত্রাপালায় যুদ্ধের দৃশ্য শু হওয়ার আগে বীর রসাত্মক বাজনা বাজানো হত। তাতে দর্শকদের মনেও বীর রসাত্মক ভাবনার সঞ্চার ঘটত। পেছনের দিকের দর্শকদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি লেগে যেত। জায়গা দখল নিয়ে তারা মারামারি করত। লেখক সেগুলোও উপভোগ করতেন। মারামারি না হলে তাঁর মন খারাপ লাগত। তবে, যুদ্ধের দৃশ্য আরম্ভ হলে তাঁর মন ঠিক হয়ে যেত। ছায়াছবির তলোয়ার খেলার দৃশ্যের থেকেও ভাল ছিল যাত্রাপালার তলোয়ার খেলা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,"তপন সিংহের 'ঝিন্দের বন্দী' (লেখক শরদিন্দু) ছবিতে উত্তমকুমারের সঙ্গে কার সঙ্গে যেন তলোয়ার খেলার একটা দৃশ্য ছিল। হলফ করে বলতে পারি এ ব্যাপারে যাত্রাদলের তলোয়ার-বাজদের দক্ষতার ধারে কাছেও আসেনি ছায়াছবির ওই তলোয়ার-খেলা।" যাত্রাদলের অভিনেতাদের প্রায়দিন তলোয়ার-বাজির খেলা

খেলতে হয়, তাই তারা তলোয়ার-বাজির খেলায় পাকা হয়ে উঠেন। ছবির নায়কদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না, তাই তারা যাত্রদলের অভিনেতাদের থেকে ভালো তলোয়ার চালাতে পারে না। 'নট্ট-কোম্পানি'র এক নায়কের কথা তিনি বলেছেন, তার নাম সম্ভবত বিমলকুমার। তিনি খুব ভলো তলোয়ার চালাতে পারতেন।

ছোটবেলায় লেখকের কাছে প্রথম প্রথম যাত্রা দেখা মানেই ছিল যুদ্ধ দেখা। সেই যুদ্ধ দেখে এসে বাড়িতে বাঁশ দিয়ে রাংতা মুড়িয়ে তরবারি বানিয়ে তলোয়ার খেলার রীতিমত প্র্যাক্‌টিস করতেন তিনি। তলোয়ার খেলার সঙ্গী ছিলেন, তাঁর দাদা। একবার তলোয়ারের ছুঁচলো অংশটা তাঁর দাদার চোখে লেগে যায়, সেই অপরাধের জন্য দাদাই তাঁকে শাসন করেছিলেন। সেই শাসনের প্রকাশভঙ্গিটা এতটাই কড়া ছিল যে, তাতে লেখকের ক্ষাত্রতেজের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ছোটবেলায় সুজিৎ চৌধুরী দুটো যাত্রাপালা পুরো দেখেছিলেন, একটি ছিল শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' এবং অপরটি যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা'। তখন তাঁর বয়স প্রায় সাত। সেকালে যাত্রাপালায় জুড়ির গান ব্যবহার হত না। তবে যাত্রা দলের সঙ্গে খুব ভাল কনসার্ট পার্টি থাকত। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি শুরু হওয়ার পূর্বে কনসার্টে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটি বাজানো হয়েছিল। তারা খুব ভাল বাজিয়েছিল। এবং নাটকটিতে বাজানোর কিছুদিন পূর্বেই গানটি তাঁর স্কুলের একটা অনুষ্ঠানের শু তে গাওয়া হয়েছিল। গানটির রিহার্সেল শুনতে শুনতে তাঁর গানটি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ---- এই দুটো কারণে গানটি শুনে লেখকের খুব ভাল লেগেছিল। নাটকটি দেশাত্মবোধক ছিল, তাই যাত্রাদলের কর্তারা এই গানটি ব্যবহার করেছিল। এটা তাঁর ভাল লেগেছিল। তবে তিনি জানেন, সবসময় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাওয়া হয় না। --- এই প্রসঙ্গে তিনি দুটো উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথমটা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা এবং দ্বিতীয়টি ফকির বাজারের ঘটনা। নজ ল ইসলামের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় ভূপেন হাজারিকার একটি গান উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয়। তাঁর তখন মনে হয়েছিল নজ লের গানের সংখ্যা তিনহাজারের বেশি তারপরও এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। আবার মৌলানা আজাদের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ফকির বাজারের একটি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' গানটি উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয়।

সেকালে শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌল্লা' বেশ জনপ্রিয় যাত্রাপালা ছিল। যখনই যাত্রাপালা জমছে না বা চলছে না, তখন যাত্রার বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে বলতেন, "'সিরাজদ্দৌল্লা' নামিয়ে দাও, এমনিতেই জমে যাবে।" লেখকও এই বিষয়ে একমত। নাটকটির জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হল, --- তার খাস বাঁধুনি। দৃশ্যের পর দৃশ্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। আর একটি কথা,--- সেকালের পরাধীন ভারতবর্ষের আবহাওয়ার এই নাটকটি মানুষের মনকে দেশপ্রেমের ভাবনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে প্রথমবার লেখক যখন নাটকটি দেখেছিলেন, তখন তাঁর নাটকটি খুব ভাল লেগেছিল। বুদ্ধি দিয়ে ভাল করে বিচার-বিবেচনার করে দেখার কথাটা তাঁর মনে পরবর্তী সময়ে এসেছে, তখন ছিল না। যে কোন কিছু না বুঝে ভাল লাগলে তা উপভোগ করলে লোকসান তো হয়ই না বরং লাভই হয় বেশি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "প্রথমবারের দেখাটা তো ভাললাগার দেখা, অতশত বোঝার ব্যাপারটা ছিলই না, আর এখন আমার মনে হয় কোনও কিছু ভাল লাগলে কোনও কার্যকারণ বিে ষণ না করে ভাল লাগাটুকু উপভোগ করাটাই বিধেয়।"

সেকালে যাত্রা-পালায় স্টেজ সাজানোর ব্যাপারটা ছিল না। 'সিরাজদ্দৌল্লা' পালায় একটা চেয়ারে জরির কাজ করা কাপড় দিয়ে ঢেকে সিংহাসন বানানো হয়েছিল। সিরাজদ্দৌল্লা সেই সিংহাসনে মাথা রেখে বলেছিলেন তাঁর প্রথম সংলাপটি। সেই সংলাপটি এত মুগ্ধকর এবং আকর্ষনীয় ছিল যার ফলে লেখকের চোখের ঘুম চলে গিয়েছিল। পুরো রাত তিনি এই পালা উপভোগ করেছিলেন, আর ঘুমোননি। সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন খুব ভাল অভিনেতা। মহম্মদী বেগের সঙ্গে সিরাজের কথোপকথনের দৃশ্যে তিনি এত ভাল অভিনয় করেছিলেন, তাতে সবার চোখে জল এসেছিল। --- সেটা ছিল সিরাজদ্দৌল্লা পালার শেষ দৃশ্য। প্রথম সংলাপে লেখক বলেছিলেন, তাঁর "গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল," এবং শেষ দৃশ্যের বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, তখন "কারো চোখই শুকনো ছিল না"--- একটা নাটক বা যাত্রা-পালার সফলতার লক্ষণ হল,---দর্শক সেই অভিনয়ের সঙ্গে কতটা একাত্ম হতে পেরেছেন, তার উপর। --- এখানে আমরা বুঝতে পারি এই পালার প্রতিটি দর্শক --- প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত একাত্ম হয়ে পূর্ণ পালা উপভোগ করে আনন্দিত হয়েছিলেন।

যোগেশ চৌধুরী 'সীতা' নাটকটি লিখেছিলেন শিশির ভাদুড়ির জন্য। এই নাটকটিও যাত্রাপালার দর্শকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছিলেন, তিনিই **সীতা** পালায় রাম চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সীতা পালার

তুঙ্গভদ্রার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন একজন পুরুষ অভিনেতা। সেকালে নারী চরিত্রগুলির ভূমিকায় পু ষ অভিনেতারাই অভিনয় করতেন। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, "তুঙ্গভদ্রার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন, তিনি পুরুষ, তখন তাই রীতি ছিল, ...।"

জমিদারদের বাড়ি ছাড়াও কখনো কখনো অপর ধনী গৃহস্থদের বাড়িতেও **যাত্রার আসর** বসত। তবে তা খুব উঁচুদরের ছিল না। তাঁদের খুব বেশি উপার্জন হতনা, তাই সর্বক্ষণ তাঁদের আর্থিক সংকট লেগেই থাকত। তাঁরা তাঁদের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোশাক কিনতে পারতেন না ; তাই অভিনয়ের পোশাক তাঁরা অপর দলের কাছ থেকে বা শহরের কোন দোকান থেকে ভাড়া করে আনতেন। রাজা বা সেই শ্রেণির অভিনেতাদের পোশাকের ভাড়া ছিল বেশি ; বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের পক্ষে সেটা ভাড়া আনাও সম্ভব হত না ; সেক্ষেত্রে তাঁরা সেই পোশাক বাদ দিয়ে অন্য কোন পছন্দের দিকে হাত বাড়াতে বাধ্য থাকতেন। লেখক আমাদের এমন ঘটনার বিষয়ে বলেছেন। একবার তাঁদের বাবা তাঁকে এমন ধরণের একটা যাত্রাপালায় নিয়ে গিয়েছিলেন। যাত্রার দলটি ছিল কুবাজপুরের। তাঁরা **টিপুসুলতান** পালা করেছিলেন। তাঁরা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিলেন। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "পোশাক-পরিচ্ছদ দুর্বল ছিল, ওইসব দলের এই ছিল অসুবিধা, অর্থের জোর কম ছিল বলে পোশাক-পরিচ্ছদ কিনতে পারতেন না। অন্য যাত্রাদলের কাছ থেকে বা শহরের পোশাকের দোকান থেকে ভাড়া করে আনতেন। সে ভাড়ার রেটও ছিল খুব চড়া।" সেই পালায় টিপু সুলতানের পোশাকটা রাজকীয় ছিল। কিন্তু হায়দর আলির পোশাকটা ততটা ভাল ছিল না। আবার টিপু সুলতানের ছেলে দুজনের সাহেবি পোশাক পরার কথা ছিল ; তাঁরা তাঁদের প্যান্টের ব্যবস্থা করতে পারেননি ; সেক্ষেত্রে দেশি পায়জামাটাকে বেল্ট দিয়ে আটকে তাঁদের পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে গ্রামবাসীরা হাসাহাসি করেনি। বিষয়টি সম্ভবত শহরের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত কয়েকজন ছাড়া উপস্থিত দর্শকদের কেউ বুঝতে পারেনি। সুজিৎ চৌধুরী এবং তাঁর সঙ্গিরা সেখানে চুপচাপই ছিলেন। এই পালায় একটা হাসির ঘটনা ঘটেছিল,--- খোলা মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল হায়দর আলির মৃত্যু দৃশ্য। অভিনেতা খুব সুন্দর এবং বাস্তব সম্মতভাবে দৃশ্যটি অভিনয় করেছিল। দৃশ্যটি সমাপ্ত হবার পর যে ব্যক্তি এই মৃত্যু দৃশ্যটি অভিনয় করেছিল, অতিরিক্ত কাজের লোকের অভাবের জন্য তাকে তুলে নিতে কেউ আসেনি। অনেকটা সময় অপেক্ষা করার পর, সে উঠে দৌড়ে চলে যায়। তাতে দর্শকরা খুব হেসেছিল।

মাঝে মাঝে ঠাণ্ডার দিনে জমিদার বাড়িতে **থিয়েটারের** আয়োজন করা হত। সেকালে থিয়েটারে যথেষ্ট টাকা পয়সা খরচ করা হত। থিয়েটার দুটো নাটক অভিনয়ের কথা লেখক আমাদের জানিয়েছেন। প্রথম নাটকটি ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং দ্বিতীয় নাটকটি ছিল মন্মথ রায়ের 'কারাগার'। জগন্নাথপুরের দারোগা কংসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল গোপেন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ঘোড়ায় চড়ে পাঁচ মাইল অতিক্রম করে প্রতিদিন পাইলগাঁও-এ রিহার্সেল করতে আসতেন। দারোগা কংসের ভূমিকায় অভিনয় করছেন শুনে দূরদূরান্ত থেকে লোক জড়ো হয়েছিল থিয়েটার দেখতে। সেবার থিয়েটারে প্রায় দেড় থেকে দু'হাজার লোক হয়েছিল।

গোপাল ভট্টাচার্য খুব ভাল অভিনেতা ছিলেন। তিনি খুব সুন্দরভাবে কংস চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। লেখক এই সম্পর্কে বলেছেন, "কংস চরিত্রের যাবতীয় বৈচিত্র্য, তাঁর ক্ষমতালিপ্সা, দম্ভ, নিষ্ঠুরতা এবং ভীতি সবই অবলীলায় অতীব বিশ্বস্তভাবে এসে গেল তাঁর অভিনয়ে---- বিশালাকার তাঁর দেহ কিন্তু স্বচ্ছন্দ ছিল তাঁর মঞ্চ বিচরণ।" 'কারাগার' নাটকটি পাইলগাঁও-এ ১৯৪৫ সালে অভিনীত হয়েছিল। তখন ভারত পরাধীন। এই নাটকটির কারাগার ছিল — অত্যাচারী ব্রিটিশের বন্দীশালা। কংস অত্যাচারী বিদেশী রাজশক্তি, বসুদেব ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার সহ্য করছিল যে ভারতবাসী তাঁদের সম্মিলিত বিদ্রোহের দলনেতা। পরাধীন ভারতবর্ষে এই নাটক মানুষর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার এই নাটকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেই নিষিদ্ধ নাটক কখনো 'কংস' আবার কখনো 'বসুদেব' নাম দিয়ে অভিনয় করানো হয়েছিল।

পাইলগাঁও স্কুলেও সেকালে নাটক অভিনীত হত। পাইলগাঁও স্কুলে দুটি নাটকের অভিনয় হয়েছিল। নাটক দুটি হল,--- সুনির্মল বসুর 'বন্দিবীর' এবং বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্তের 'সিরাজের স্বপ্ন'। মহারাজ পু এবং আলেকজাণ্ডারের বাকযুদ্ধ নিয়ে লেখা **'বন্দিবীর'** নাটকটি। নাটকে ওঙ্কার সিং এবং টঙ্কার সিং-কে নিয়ে একটি কৌতুক দৃশ্য আছে। ওঙ্কার সিং-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মনোরঞ্জন দত্তচৌধুরী (মনুদা)। তিনি খুব ভাল অভিনেতা ছিলেন। নাটকটিকে তিনি তাঁর সুনিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জমিয়ে রেখেছিলেন। নাটকটি সেকালে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। **'সিরাজের স্বপ্ন'** নাটকে নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ক্লাস টেনের ছাত্র বিজয়। তিনি খুব ভাল অভিনয় করেছিলেন। হেডমাস্টার মশাই মঞ্চে তামাক খাওয়ার অনুমতি দেননি, তাই

আলিবর্দি খাঁয়ের তামাক খাওয়ার দৃশ্যটা তিনি আগুনবিহীন গড়গড়ায় শব্দ করে অভিনয় করেছিলেন। নাটকের আর একটি দৃশ্যে ছিল, ভাস্কর পণ্ডিত বক্তৃতা দেবেন এবং মোহনলাল মৃদুমন্দ হাসবে। কিন্তু নাটক অভিনয়ের সময় ভাস্কর পণ্ডিতের বক্তৃতা শু করার এক মিনিটের মধ্যেই মোহনলাল অট্টহাস্য করে উঠে। তাঁর হাসি শুনে ভাস্কর পণ্ডিত তাঁর সংলাপ ভুলে যান। মোহনলালের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সতীশ। তিনি খুব সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। সবাই মনে করল, তিনি সিদ্ধি খেয়ে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে তা ছিল না। তিনি তাঁর ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের কাছে 'মৃদুমন্দ হাসির' মানে জানতে গিয়েছিলেন। সেই ফার্স্ট বয় তাঁকে 'মৃদুমন্দ হাসির' মানে 'অট্টহাসি' বলেছিলেন। তাই তিনি অভিনয়ের সময় অট্টহাসি হেসেছিলেন।

সেকালে গ্রাম অঞ্চলে শিশুদের মনোরঞ্জন করার জন্য খুব বেশি অর্থ খরচ করা হত না। স্বল্প অর্থে সীমিত আয়োজনে শিশুদের আনন্দ উপভোগ করায় কোন ঘাটতি ছিল না। সেকালের গ্রামের শিশুরা গ্রামাফোন রেকর্ডের গান শুনে, যাত্রা উপভোগ করে, জমিদার বাড়িতে থিয়েটার দেখে, গ্রামের স্কুলে নাটকের অভিনয় দেখে---- ইত্যাদি যখন যেভাবে যেদিক থেকেই সুবিধে পাওয়া যেত সমস্ত উপকরণ থেকে নিজেদের আনন্দ খুঁজে নিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত প্রাবন্ধিক সুজিৎ চৌধুরী তাঁর *হারানো দিন হারানো মানুষ* গ্রন্থে অবিভক্ত ভারতবর্ষের সাধারণ গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জনের জন্য খুব কম খরচে যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হত--- সেই বিষয়ের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা তাঁর এই গ্রন্থে দিয়েছেন। তাঁর 'হারানো দিন হারানো মানুষ' গ্রন্থের 'বিনোদন (১)' অংশে আমরা সেকালের শিশুদের বিনোদনের উপকরণ এবং বিনোদনের বিবরণ জানতে পারি। তাঁর এই পরিশ্রম অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

২) প্রশ্ন : লেখক সুজিৎ চৌধুরীর গায়ের বর্ণ কালো ছিল।— এই বিষয়ে লেখক বর্ণিত ঘটনাগুলির বর্ণনা দাও।

উত্তর : লেখক সুজিৎ চৌধুরীর গায়ের বর্ণ কালো ছিল।--- এই বিষয়ে লেখক তিনটি ঘটনার কথা বলেছেন।

প্রথম ঘটনা : একবার তাঁদের মাসির বাড়িতে **গ্রামাফোন রেকর্ডে গান শোনানোর** আসর বসে। সেবার শিল্পী ছিলেন একজন মহিলা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গ্রামাফোন রেকর্ডের মালিক। জাতিতে তিনি ছিলেন মুসলমান। তিনি লুঙ্গি পরে তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। গানের আসর আরম্ভ

হওয়ার আগে তিনি একটা ভাষণের মধ্য দিয়ে সবাইকে গান শোনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। শিল্পী মহিলা গেয়েছিলেন, "মাগো আমার কালে জামাই ভালো লাগে না।"--- গায়ের বর্ণ কালো ছিল বলে এ গান সোনার পর ছোট সুজিৎ চৌধুরীর মন খারাপ হয়ে যায়। গায়ের রং কালো বলে বধূ পাওয়া যাবে না, এ বিশ্বাস তাঁর মনে জেগে উঠে। এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে দিদিমণি তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "কেষ্টঠাকুরকে দেখিসনি, কালোর জেল্লায় কেমন জগৎ মাতিয়ে দিয়েছিল।" দিদিমণির একথায় তাঁর ভারী মন অনেকটা হালকা হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা : একটা কাজের জন্য দু'বছরের জন্য তাঁকে ১৯৯৩ সালে সিমলা যেতে হয়েছিল। তখন দিদিমণি অনেকটা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি দিল্লিতে তাঁর ছোট ছেলে মানসের কাছে থাকেন। সেই সময় সিমলা যাওয়ার পথে তিনি দিল্লিতে মানসের বাড়িতে গিয়েছিলেন। মানস তাঁর মাকে জানান, সুজিৎ চৌধুরী সিমলা যাচ্ছেন। উত্তরে তিনি বলেন, "সে তো খুব ভালো কথা, জামাই তাহলে এবারে একটু ফর্সা হবেন।"--- অর্থাৎ জামাতার গায়ের বর্ণ কালো, বিষয়টা তাঁর মনের কোণে সুপ্ত অবস্থায় ছিল।--- তাই সুজিৎ চৌধুরীর সিমলা যাওয়ার প্রসঙ্গে এ কথাটা তাঁর মুখ থেকে বেরোয়।

তৃতীয় ঘটনা : সুজিৎ চৌধুরীর মা-ও ছেলের গায়ের বর্ণ কালো ছিল বলে কখনো কখনো বিব্রত বোধ করতেন। একবার তিনি তাঁর ছোট্ট অংশুকে (সুজিৎ চৌধুরী) নিয়ে জমিদার বাড়িতে যাত্রা দেখতে গিয়েছিলেন। তখন অংশুর বয়স প্রায় এক বছর। তাঁর মা সুপ্রভা চৌধুরী দেখেন, তাঁর আশেপাশের সব মহিলাদের কোলের বাচ্চারা খুব ফর্সা। লজ্জায় তিনি তখন অংশুকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।

৩. প্রশ্ন : পাঁচ বছর বয়সে লেখক সুজিৎ চৌধুরীর ঘাড় কীভাবে বাঁকা হয়েছিল ? সেই বাঁকা ঘাড় কীভাবে ঠিক হয়েছিল ?

উত্তর : পাইলগাঁও স্কুলে নাটক অভিনীত হত। অভিনয়ের পোশাকগুলি লেখক সুজিৎ চৌধুরীদের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেই পোশাকের মধ্যে ছিল মহম্মদি বেগের জল্লাদের পোশাক। তাঁদের 'দাদাবাবু' সেই পোশাক পরে তাঁদের 'ফুলদা'কে ভয় দেখানোর জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় সেখানে পাঁচ বছর বয়স্ক সুজিৎ চৌধুরী এসে পড়েন। দাদাবাবুর মনে হয় ফুলদা এসে গেছেন। তিনি দরজার আড়াল থেকে লাফ মেরে

সুজিৎ চৌধুরীর সামনে এসে পড়েন। তাতে সুজিৎ চৌধুরীর দাঁত লেগে যায়। ভয়ের দাপটে তাঁর জ্বর হয়। চিকিৎসার ফলে জ্বর কমে যায়, কিন্তু তাঁর ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়। সেই গ্রামের 'বাতাসির মা' বলে একজন ভদ্র মহিলা কেরোসিন ও নুন দিয়ে মালিশ করে তাঁর বাঁকা ঘাড় সোজা করে দেন।

RITA DEY